

Vol. 55 | No. 2 | 2018

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জহির রায়হানের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য

Volume	55
Issue	2
Year	2018
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mohammad Sakibul Hasan
Published online	February 1, 2018
DOI	10.62328/sp.v55i2.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v55i2.10
Pages	১৮৫-১৯৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ২ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

জহির রায়হানের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য

মোহাম্মদ সাকিবুল হাসান*

সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যের ধারায় জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২) প্রাতিস্বিক ব্যক্তিত্ব। সমকালীন জীবন ও সমাজের প্রতি দায়বোধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রচনা করেছেন সাহিত্যের বিবিধ রূপকল্প। কথাসাহিত্য, বিশেষত ছোটগল্প রচনায় তাঁর সাফল্য ও সিদ্ধি ঈর্ষা-জাগানিয়া। সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তিনি নির্বাচন করেছেন তাঁর ছোটগল্পের বিষয়। রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বিবিধ বিরোধ-বৈষম্য, ধর্মান্ধতা, সংস্কারবুদ্ধি, মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তের বিচিত্রমুখী সংকটের স্বরূপ অসাধারণ নৈপুণ্যে চিত্রিত করেছেন তিনি। বর্তমান প্রবন্ধে জহির রায়হানের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্যের স্বরূপ-সন্ধানের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে।

বিভাগোত্তর বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির পট-পরিমণ্ডলের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিত্ব জহির রায়হান। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী ও চলচ্চিত্র নির্মাতা। জীবন ও জগৎসম্পর্কিত ইতিবাচক উপলব্ধি, মানববাদে আস্থা, প্রগতিশীল সমাজদৃষ্টি তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত উপাদান। সমকালীন জীবনের নানামাত্রিক সমস্যা ও সংকটের স্বরূপ উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ তাঁর কথাসাহিত্য। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার জীবনমুখী বর্ণনা-বিবৃতিতে তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প কিংবা চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে অনন্যস্বাদী। সহজ-সরল ভাষাগ্রন্থনায় কাটা-কাটা সংলাপে তিনি তাঁর গল্পে তৈরি করেছেন ঐন্দ্রজালিক আবহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে শুরু করে ভারত-বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতির বাস্তব আলেখ্য নির্মাণে তাঁর গল্প তাৎপর্যমণ্ডিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জীবনবাস্তবতা, দুর্ভিক্ষ-মহামারি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারতবিভাগ, ভাষা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতা একদিকে যেমন জহির রায়হানের সাহিত্যপ্রতিভা নির্মাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে অন্যদিকে তেমনি এসব বিষয়ই হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পের নিয়ামক উপাদান। রাষ্ট্রযন্ত্রের শোষণ-বৈষম্য, বাঙালি জাতিসত্তার উজ্জীবন-আকাঙ্ক্ষা, অসাম্প্রদায়িক

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i2.10

জীবনানুভব তাঁর ছোটগল্পকে যেমন স্বতন্ত্র করেছে, তেমনি সমাজ-অন্তর্গত ব্যক্তিচৈতন্যের ধর্মান্ধতা, অতীতচারিতা, গোঁড়ামি, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি ও অযৌক্তিক সংস্কারপ্রিয়তার উপস্থাপনায় তাঁর গল্প হয়ে উঠেছে সমকালীন জনজীবনভাষ্য। স্বকাল ও স্বসমাজের প্রায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষই জায়গা করে নিয়েছে তাঁর গল্পভুবনে। তাঁর গল্পের পটভূমি স্বকাল, স্বসমাজ ও মার্কসীয় চেতনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে বিশিষ্ট।

সমকালীন সময়, সমাজ ও রাজনৈতিক ঘটনাস্রোত জহির রায়হানের মানসগঠনে পালন করেছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। জন্মসূত্রে তিনি পশ্চাৎপদ এক জীবন ও সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর অস্তিত্বমূলে ধারণ করলেও একপর্যায়ে পিতার চাকরিসূত্রে তাঁকে অবস্থান করতে হয় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশের কেন্দ্রস্থল কোলকাতায়। এখানে অবস্থানসূত্রে তিনি ভারতবর্ষীয় রাজনীতির উল্লেখযোগ্য ঘটনাধারার সঙ্গে পরিচিত হন। এই সময়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা (১৯৩৯-১৯৪৫), তেতাল্লিশের মন্বন্তর (১৯৪৩), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), ভারত-বিভাগ (১৯৪৭) প্রভৃতি। এসব ঘটনা তাঁর মনোগঠনে পালন করেছে কার্যকর ভূমিকা। সাম্রাজ্যবাদের বিষনখরে ছিন্নভিন্ন ও বিপর্যস্ত মানুষের নিদারুণ অসহায়তা তাঁকে কেবল বেদনাবিদ্ধই করেনি বরং উন্নীত করেছে সদর্থক জীবনচেতনায়। তাঁর শিল্প ও সাহিত্যকর্মে তাই এই চেতনারই লক্ষণীয় উপস্থিতি।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে কৃত্রিম-রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হলে জহির রায়হান পিতার সঙ্গে কোলকাতা ছেড়ে চলে আসেন ঢাকায়। এই সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেন পাকিস্তানের প্রতি তীব্র আবেগময় মোহগ্রস্ততা। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্রের শোষণ-নিগ্রহের কারণে বছর না গড়াতেই তাদের মোহভঙ্গ হতে শুরু করে। বিশেষত রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে যুবসমাজের মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং শাসকদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে রাজপথ উত্তপ্ত হতে শুরু করলে পাকিস্তানিরা দমন-পীড়নের ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিলে তারা গুলি চালায় এবং ঢাকার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত করে তোলে; হত্যা করে কয়েকটি তরুণ-তাজা প্রাণ। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় অতিদ্রুত পাল্টে যায় এই ভূখণ্ডের রাজনীতি; সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে-সংক্ষোভে উন্মুখর হয়ে ওঠে, উপ্ত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের রক্তাক্ত বীজ। যুবসমাজের মধ্যকার এই পরিবর্তনের চিত্রটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি* গ্রন্থে :

> পূর্ব বাংলার যুবসমাজ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন করেছিল এবং তারা প্রাণ বিসর্জনও দিয়েছিল। সরকারি দমননীতি সত্ত্বেও তারা জয়যুক্ত হয়েছিল, কারণ স্বাধীনতার পর তাদের মধ্যে এসেছিল এক শুভ পরিবর্তন। পুরোহিত-অধ্যুষিত সমাজকে বর্জন করে জীবনের নতুন এবং আধুনিক উদ্দেশ্যগুলি তারা খুঁজে ফিরছিল। ... নিজগৃহে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। (কামরুদ্দীন, ২০১৪ : ১১৯)

মূলত দেশভাগের পর ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যুবসমাজের এই অস্তিত্ব-অন্বেষাই পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশে রূপান্তর করতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল। কথাসাহিত্যিক জহির রায়হানও পূর্ব বাংলায় বসবাসরত মুক্তিকামী মানুষের আকাঙ্ক্ষার সমান্তরালে নিজেকে স্থাপন করে এর প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তিনি বাম-ঘরানার রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য কারাবরণও করেন। বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকার কারণে তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রতিফলন ঘটে মার্কসীয় চেতনাদর্শের । এ সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য স্মরণযোগ্য :

> মার্কসবাদী চেতনা তাঁর সৃজনশীল শিরার মধ্যে কাজ করেছিলো। রাজনৈতিক চেতনা তিনি কখনোই হাতছাড়া করেননি। বরাবরই ছিলেন তিনি মার্কসবাদী চেতনার রাজনৈতিক চিন্তাশীল শিল্পী। (মাহমুদুল, ২০১১ : ১১)

সমাজ ও মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁকে অন্যায়-অবিচার-শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন-নিগ্রহের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ ছিল উচ্চকিত, নির্দ্বিধ ও লক্ষ্যভেদী।

২

সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যানে জহির রায়হানের গল্পের সংখ্যা স্বল্প হলেও বিষয়বৈচিত্র্যে তাৎপর্যপূর্ণ। সমকালীন মানুষের বিচিত্র জীবনধারা ও জীবনানুভব হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পশিল্পের নিয়ামক উপাদান। যুদ্ধ, বিশেষত বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর, ভাষা আন্দোলন, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ, বাঙালির অধিকারবোধ এবং সমকালীন জীবনবাস্তবতা তাঁর ছোটগল্পের উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিষয়-নির্বাচনেই কেবল নয়, বিষয়-বয়নেও তিনি রেখেছেন স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর।

২.১

জহির রায়হান যুদ্ধ, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অবলম্বন করে রচনা করেছেন বেশকিছু গল্প। যুদ্ধকালে তাঁর অবস্থান ছিল নগর কোলকাতায়। ফলে যুদ্ধের ভয়াবহতায় মানব-ভূগোলে কী করুণ বিপর্যয় সাধিত হতে পারে তা তিনি ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। যুদ্ধ মানেই মানবজীবন ও সম্পদের অভাবনীয় ও অপূরণীয় ক্ষতি। যুদ্ধ কেবল মানবজীবন ও সম্পদের ক্ষতিসাধনই করে না, বরং এর অভিঘাতে সুস্থ ও স্বস্থ জীবনে নেমে আসে শঙ্কা, বিস্ময়, অবিশ্বাস, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা ও নিঃসঙ্গতার মতো ভয়াবহতা। ফলে মানুষ প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। যাপিত জীবন ও সমাজপরিবেশে নেমে আসে এক অনতিক্রম্য সংকট। সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের দ্বারা সৃষ্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন এক সংকট ও বিপর্যয়ের সূচনা করেছিল যা ক্ষয়ক্ষতি, ভয়াবহতা কিংবা প্রাণহানির মানদণ্ডে পৃথিবীর যেকোনো সময়ের যেকোনো যুদ্ধের চেয়ে ছিল মারাত্মক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট মানবিক সংকটের চিত্র সমকালীন অনেক কথাসাহিত্যিকই তাঁদের গল্প-উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, সরদার জয়েনউদ্দীন, শহীদুল্লা কায়সার প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের মতো জহির রায়হানও বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর ছোটগল্পে। এ সময় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির যুদ্ধনীতি কীভাবে বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারি নিয়ে এসেছিল তার স্বরূপ তুলে ধরেছেন জহির রায়হান তাঁর 'জন্মান্তর' গল্পে। গল্পটি ঢাকা শহরকেন্দ্রিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। গল্পের নায়ক মন্তু শেখ; যার বাবার স্বপ্ন ছিল তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলবে, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে তার বাবার স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেয় – তারই মর্মন্তুদ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে গল্পটিতে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্‌পর্যায়ে নিজেদের জমিতে হালচাষ করে কোনোরকমে তাদের সংসার চলে যেত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যরা দখল করে নেয় তাদের ফসলি জমি। গল্পকারের ভাষায় : 'তখন যুদ্ধের মওসুম। সৈন্যরা এসে জমিগুলো সব দখল করে নিল ওদের।' (জহির, ২০০৯ : ৭৯) শুধু তাই নয়, ইংরেজ সৈনিকদের জন্য খাবার মজুদ এবং অসাধু ব্যবসায়ীসৃষ্ট কৃত্রিম সংকটের কারণে দুর্ভিক্ষ-কবলিত হয়ে মন্তুকে হারাতে হয় মা-বাবা-ভাই-বোন সবাইকে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে সে চলে যায় শহরে কিন্তু সেখানেও দুর্ভিক্ষে কাতর মানুষের মিছিল। পথ-ঘাট-ডাস্টবিন ছেয়ে গেছে মানুষের মৃতদেহে। গল্পকার ঢাকা শহরের এই করুণ দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন : 'শহর নয়তো প্রেতপুরী। পথে ঘাটে ডাস্টবিনে মৃতের ছড়াছড়ি। অলিতে গলিতে অসংখ্য ক্ষুধিতের মিছিল।' (জহির, ২০০৯ : ৮০) যুদ্ধের এই ভয়াবহ দিনে কোথাও কোনো কাজ না পেয়ে মন্তু যোগ দেয় পকেটমারের মতো হীনবৃত্তিতে। পকেট মারতে গিয়ে একদিন সে পেয়ে যায় জ্বলজ্বলে একটা সোনার আংটি এবং স্বপ্ন দেখে 'নবী সিকদারের লাল টুকটুকে নাতনী পরীবানু'কে (জহির, ২০০৯ : ৮১) বিয়ে করার। মন্তুর স্বপ্ন হয়তো বাস্তবায়িতও হতো। কিন্তু মন্তু তার স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়ে মানবিক দায়িত্ব পালন করেছে সংসারযাত্রায় বিপর্যস্ত এক হতদরিদ্র কেরানির পকেটে সোনার আংটি রেখে এসে। তাই গল্পের শেষ হয়েছে রাহুগ্রাসে থাকা মানবতার আত্ম-উন্মোচনের মধ্য দিয়ে : 'বৃষ্টিটা তখন থেমে গেছে। আর রাহুমুক্ত চাঁদ খলখলিয়ে হাসছে আকাশে।' (জহির, ২০০৯ : ৮৪) যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি মন্তুকে সর্বহারা করেছে, পকেটমার বানিয়েছে, সেই দুর্ভিক্ষে সর্বস্বহারা এক কেরানির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের চিত্রাঙ্কনসূত্রে জহির রায়হান তাঁর সদর্থক জীবন ও সাহিত্যদৃষ্টিকেই উচ্চকিত করে তুলেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় ঘটনার প্রেক্ষাপটে লেখা 'ম্যাসাকার' গল্পে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে জনৈক ডাক্তারের জবানিতে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তীব্র লালসা কীভাবে স্বদেশের মানুষদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল ষোল বছরের যুবক জর্জের মধ্য দিয়ে সেই সত্যই পরিস্ফুট হয়েছে এ-গল্পে। গল্পে দেখা যায়, উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদ বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাওয়া এডোয়ার্ডকেও জোরপূর্বক যুদ্ধে

নিয়ে আসে; তছনছ করে দেয় তার স্বপ্নসাধ। এভাবেই অনৈতিক লালসার কাছে পরাস্ত হয় জর্জ আর এডোয়ার্ডের মতো হাজার হাজার তরুণের স্বপ্নবাসনা। সংবেদনশীল কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান অত্যন্ত মমত্বের সঙ্গে সেইসব তরুণের বেদনার্ত হৃদয়ের হাহাকার তুলে ধরেছেন 'ম্যাসাকার' গল্পে। জর্জের কথায় উঠে এসেছে সাম্রাজ্যবাদী হায়েনাদের নেপথ্যের কূটচিত্র : 'জানো ডাক্তার! এরা আমায় জোর করে যুদ্ধক্ষেত্রে ধরে নিয়ে এসেছে। এরা আমায় – এরা আমায় জোর করে আমার মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে।' (জহির, ২০০৯ : ১০৭)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলায় নিরন্ন মানুষের হাড্ডিসার দেহ নিয়ে শিয়াল, কুকুর আর শকুনের উন্মত্ত টানাটানির দৃশ্য ছিল প্রাত্যহিক ব্যাপার। রাস্তার কুকুর আর নিরন্ন মানুষ হন্যে হয়ে যুগপৎ খাদ্য খুঁজেছে ডাস্টবিনে। যুদ্ধের সেই বীভৎস দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন :

> দ্বিতীয় মহাসমর। আর দুর্ভিক্ষ-জর্জরিত সোনার বাংলা, চারদিকে শুধু হাহাকার, অন্ন নেই! বস্ত্র নেই! নেই! নেই! কিছু নেই! শুধু আছে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আর অভাব অনটন। (জহির, ২০০৯ : ১১২)

সব যুদ্ধেই নারীকে হতে হয় চরম বর্বরতার শিকার; হারাতে হয় সম্ভ্রম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এই মহাসমরে বিশ্বব্যাপী নারীকে নিপীড়ন, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে চরমভাবে। 'ম্যাসাকার' গল্পে জহির রায়হান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নারীর প্রতি সাম্রাজ্যলিপ্সুদের ঘৃণ্য প্রলোভনের চিত্র পরিবেশন করেছেন অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি-চরিত্রগুলো নারীকে যে ভোগের বস্তু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না তা মেজর কলিনসের ভাষ্যসূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে এ-গল্পে :

> রাশ্যার উজবেকি আর কাজাকি তরুণীর শালীনতার বুকে ছুরি হেনে, ওদের ন্যাংটা নাচাব আমরা, ভারতের লজ্জাবতী মাংসপিণ্ডগুলোর ঘোমটা উলটিয়ে আমরা চুমো খাব। আর আমাদের কামনা চরিতার্থের জন্য ওদের আমরা ব্যবহার করব। ঠিক জুতো আর মুজোকে আমরা যে-রকম ব্যবহার করে থাকি। (জহির, ২০০৯ : ১১৭)

এভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মেজর কলিনসের মতো নারীলোলুপ অফিসারদের হাতে লক্ষ লক্ষ নারীকে হারাতে হয়েছে তাদের সম্ভ্রম । এই মানুষরূপী হিংস্র জন্তুদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে। তাই মিলিটারি হাসপাতালের ডাক্তার কর্তৃক মেজর কলিনসের মুখে বসিয়ে দেয়া চড় প্রকৃতপক্ষে নারীলোলুপ, সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির মুখেই যেন জহির রায়হানের চপেটাঘাত।

২.২

বাঙালির জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশবিভাগোত্তর বাংলা সাহিত্যের ধারায় ভাষা আন্দোলন সঞ্চার করেছিল এক নবতর মাত্রা। আপাতদৃষ্টিতে

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ভাষা আন্দোলনের দাবি হলেও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল বাঙালির আর্থ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থের প্রশ্নও। মূলত ভাষা আন্দোলনই বাঙালি জাতিকে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত করে। ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে জহির রায়হান তাঁর ছোটগল্পে এর বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন।

'সূর্যগ্রহণ' গল্পে জহির রায়হান মাতৃভাষা, কবিতার ভাষা বাংলাকে বাঁচাতে অকাতরে জীবন উৎসর্গকারী কবি তসলীমের আত্মত্যাগের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন আনোয়ার সাহেবের জবানিতে। তসলীম ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে আর আনোয়ার সাহেব কবি তসলীমের বিপর্যস্ত পরিবারকে গোপনে সহায়তাদানের মাধ্যমে দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। 'যুগপৎ দেশপ্রেম ও মানবিকতার বিবেচনায় একুশকে পটভূমি করা এ-গল্প তুলনা-রহিত।' (আরজুমন্দ, ২০০৮ : ২৬৯-৭০)

একটি মৃত্যুর প্রভাব যে কত বিচিত্র, বিস্তৃত ও ব্যাপক হতে পারে তারই অনুপুঙ্খ বিবরণ হলো 'মহামৃত্যু' গল্পটি। এ গল্পে জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে একটি সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপিত করে তুলেছেন; যেখানে বুড়ো সুরেন উকিলের ছোট মেয়ে শিবানী, হোসেন ডাক্তারের দুই নাতনি, ঝগড়াটে পল্টুর মা, ট্যাক্সি-ড্রাইভার ফজল শেখ একাত্ম হয়ে যায় পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদের চেতনার সঙ্গে। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আবেগ-অনুভূতি, পরিবারকেন্দ্রিক সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা প্রাধান্য বিস্তার করলেও সামষ্টিক কর্মকাণ্ডে মানুষ আর সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে না। সমষ্টির সঙ্গে সে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। তাই 'মহামৃত্যু' গল্পেও দেখা যায় পুলিশের গুলিতে নিহত ছেলেটিকে কেউ চিনতে না পারলেও সবাই তার সাথে একাত্মতা বোধ করে। গল্পকারের ভাষায় :

> বাহাত্তর গেরস্থের বাড়ীতে কত লোক আসে, কত লোক যায়। কে কার খোঁজ রাখে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে সবসময়। কিন্তু, অকস্মাৎ আজ সবাই এক অদ্ভুত একাত্মতা অনুভব করল ওই ছেলেটার সাথে। (জহির, ২০০৯ : ৪৯)

পল্টুর মা – কঞ্জুস বলেই যার পরিচিতি, সে-ও শহীদের সৎকারের কাপড় কেনার জন্য অকাতরে দুই টাকা দিয়ে দেয়। ট্যাক্সি ড্রাইভার ফজল শেখও তার সারাদিনের উপার্জিত টাকা দিয়ে দেয় মৃতের সৎকারের দাফন-কাফনের জন্য। মূলত ভাষা আন্দোলনে নিহত শহীদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যকার ইতিবাচক পরিবর্তনের চিত্রটি লেখক অঙ্কন করেছেন এ-গল্পে।

'অতি পরিচিত' গল্পে জহির রায়হান রূপকের আশ্রয়ে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধশক্তির মুখোশ উন্মোচন করেছেন। রেশনের দোকানের মালিক হয়েও পাকিস্তানি শাসকদের দালালি করে রাতারাতি শিল্পপতি বনে যাওয়া ট্রলির বাবা এক সময় কেন্দ্রীয় শিক্ষা

বিভাগের বড়কর্তার পদ দখল করে নেয়। সাহিত্য-সংস্কৃতির সংস্রব-বঞ্চিত এই চরিত্রটি তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (১৮৬১-১৯৪১) চেনে না; *গীতাঞ্জলি* (১৯১০)-র মাহাত্ম্য বোঝে না। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে তাই সে উচ্চারণ করে মুর্খ-বক্তব্য : 'ও গীটাঞ্জলী, ওহ! চমৎকার বই! মিলটনের একখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।' (জহির, ২০০৯ : ৭২) কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের এই কূপমণ্ডূক কর্মকর্তা 'গীতাঞ্জলি' সম্পর্কে কিছু না জানলেও নিজের পড়াশোনার দাম্ভিকতা জাহির করতে একটুও পিছিয়ে থাকে না। ট্রলির বন্ধু আসলামকে উদ্দেশ্য করে সে তাই বাংলা-ইংরেজি মিশ্রিত সংলাপে বাংলা ভাষার ঐতিহ্য নিয়ে তাচ্ছিল্যজ্ঞাপক উক্তি করে :

> দ্যাখো আসলাম আমি যা-কিছু বলি থরো স্টাডি করেই বলি। আমি বলছি তোমায়। অনেক স্টাডি করে আমি দেখেছি। বাংলা ভাষার নিজস্ব ঐতিহ্য বলে কিছু নেই। (জহির, ২০০৯ : ৭১)

সমাজ ও রাজনীতিসচেতন জহির রায়হান এভাবে তাঁর ছোটগল্পে বাংলা ভাষার বিরোধিতাকারীদের স্বরূপ উন্মোচনে ছিলেন অকুণ্ঠচিত্ত ও নির্ভীক।

যে চেতনাকে বুকে ধারণ করে ভাষা-শহিদেরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, আন্দোলনের উনিশ বছর পরে এসে গল্পকার জহির রায়হান প্রত্যক্ষ করেন – ব্যক্তিস্বার্থ আদায়ের জন্য কীভাবে সেই চেতনার অপব্যবহার করছে স্বার্থান্বেষী মহল। 'কয়েকটি সংলাপ' গল্পে জহির রায়হান পূর্বাপর সেই ঘটনাই বর্ণনা করেছেন তির্যক ভঙ্গিতে। মূলত ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষসূত্রে যুক্ত ছিলেন বলেই তিনি একুশের চেতনাবিরোধী চক্রের সুবিধাবাদী চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করতে পেরেছিলেন নিখুঁতভাবে।

'একুশের গল্প'তে জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনে শহিদ তপুকে জীবন্ত অবয়বে উপস্থাপন করেছেন। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' প্ল্যাকার্ড হাতে যে তপু চার বছর আগে পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিল, সে-ই আবার ফিরে আসে নব অবয়বে – কঙ্কাল হয়ে। সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল, স্বপ্নাতুর, বন্ধুবৎসল ও দায়িত্ববান তপুকে ফিরে পেয়ে গল্পকথক ও তার বন্ধু রাহাত উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে। সেই মুহূর্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন :

> ক্ষণকাল পরে 'স্কাল'টা দু-হাতে তুলে ধরে রাহাত বলল, তপু। বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এল ওর। (জহির, ২০০৯ : ১২৪)

বস্তুত তপুর কঙ্কাল আবিষ্কারের ঘটনার মধ্য দিয়ে গল্পকার ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিময় মুহূর্তসমূহের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছেন এ গল্পে।

২.৩

জহির রায়হানের ছোটগল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী সমাজব্যবস্থার বিশ্বস্ত রূপায়ণ। সমাজ ও রাজনীতির একনিষ্ঠ রূপকার জহির রায়হানের

গল্পে সমাজের অন্যায়-অনাচার দূরীভূত করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা উচ্চারিত হয়েছে বার বার । তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন সমাজে বিরাজমান নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার দেয়াল। বৈষম্যের এসব দেয়াল ভেঙে তিনি বিনির্মাণ করতে চেয়েছেন এমন এক সমাজ, যেখানে থাকবে না কোনো বৈষম্য-শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতন। ধর্মঘটে অংশ নেয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারা এক তরুণের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি এবং তা থেকে উত্তরণের বয়ান হলো 'ইচ্ছার আগুনে জ্বলছি' গল্পটি। আইন-সমাজ-ধর্ম ও রাজনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ স্বপ্নকে সে মুক্ত করতে চায়। তার সেই প্রচেষ্টার বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন :

> ইচ্ছার আগুন বুকে জ্বেলে রেখে তবু সে ছুটছে আর ভাঙছে। সহস্র দেয়ালের নিচে মাথা কুটে কুটে সে বলছে, মুক্তি দাও। আমাকে মুক্তি দাও। (জহির, ২০০৯ : ৯৪)

সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির নানামাত্রিক জটিলতা, সংকট ও সম্ভাবনার চিত্র অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপিত হয়েছে জহির রায়হানের ছোটগল্পে। 'কতকগুলো কুকুরের আর্তনাদ' গল্পে জহির রায়হান সমাজের পচনের চিত্র অঙ্কন করেছেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। কুকুরের আর্তনাদ সমাজের জন্য কোনো শুভ ইঙ্গিত নয়। মূলত গল্পটিতে 'জহির রায়হান লোভী, স্বার্থপর ভদ্রলোকদেরই কুকুরের প্রতিকৃতিতে রূপদান করেছেন।' (মাহমুদুল, ২০১১ : ৩১) কুকুরের আর্তনাদের রূপকে গল্পকার সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

'পোস্টার' গল্পে জহির রায়হান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের বৈপ্লবিক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন পোস্টারের রূপকল্পে। অফিসের কেরানি আমজাদ সাহেব একসময় 'হোয়াইটওয়াশ' করা দেয়ালে পোস্টার দেখলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন, অবশেষে সে-ই আমজাদ সাহেব-ই কীভাবে পোস্টারের বিজ্ঞাপনের সাথে একাত্ম হয়ে যান – তারই শৈল্পিক বয়ান হলো 'পোস্টার' গল্পটি। শাসক শ্রেণি সম্পর্কে আমজাদ সাহেবের ধারণা ছিল : 'দেশের মধ্যে সাচ্চা কেউ যদি থেকে থাকে তো ওরাই আছে। ওরাই লড়ছে দেশের স্বার্থের জন্য।' (জহির, ২০০৯ : ৮৫) কিন্তু চাকরি থেকে ছাঁটাই হবার পর তিনি অবশেষে সেই মুখোশধারী শাসকদের স্বরূপ বুঝতে পারেন এবং দেয়ালে পোস্টার সেঁটে দেয়া তরুণদের সাথে একাত্ম হয়ে যান।

২.৪

বাঙালির জাতীয় জীবনের প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনা জহির রায়হানের শিল্পীসত্তাকে আলোড়িত-আন্দোলিত করেছে। ফলে রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের বয়ান তাঁর গল্পের বিষয় হিসেবে এসেছে বারবার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন, পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতন, সর্বোপরি বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা – একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তাঁর ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। পাকিস্তান

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রতিটি রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর ছোটগল্পের অবয়ব নির্মিত হয়েছে। দেশভাগ-পরবর্তী প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। সঙ্গত কারণেই আন্দোলন-সংগ্রামের সেই ধারাবাহিক চালচিত্র উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। 'পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে যে ধারাবাহিক সংগ্রাম ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি তার ভাষিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য অর্জনের পথে অগ্রসর হয় সেই আন্দোলন গাথা জহির রায়হানের গল্পে উজ্জ্বল রূপ লাভ করেছে। (চঞ্চল, ২০০৯ : ১০৫)

একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে জহির রায়হানের একমাত্র ছোটগল্প 'সময়ের প্রয়োজনে'। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে লেখা দিনপঞ্জিধর্মী এ গল্পে উঠে এসেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলার জনজীবনের রূপ, পথঘাট, রেলস্টেশন, পাক সেনাদের নৃশংসতা, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শ্রেণি- পেশার মানুষের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অভিমতসহ বিচিত্র বিষয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গণমানুষের সংগ্রামী চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

> জনতার সমুদ্র।
> সমুদ্রের চেয়ে গভীর।
> সাগরের চেয়েও উত্তাল।
> গতিময়। (জহির, ২০০৯ : ১৮)

অসাম্প্রদায়িক চেতনাঋদ্ধ গল্পকার জহির রায়হান তাঁর 'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক চিত্র অঙ্কন করেছেন দক্ষতার সাথে। একটি প্রশিক্ষিত, আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে এদেশের নিরস্ত্র জনতা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কেবল মনের জোরে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধে সর্বশ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণের স্বীকৃতি রয়েছে জহির রায়হানের বর্ণনায়; যা চালচ্চিত্রিক পরিচর্যায় অসাধারণ :

> সাতাশজন মানুষ।
> নানা বয়সের। ধর্মের। মতের। ...
> কেউ ছাত্র ছিল। কেউ ছিল দিন-মজুর।
> কৃষক। কিংবা মধ্যবিত্ত কেরানি। পাটের দালাল।
> অথবা পদ্মাপারের জেলে। (জহির, ২০০৯ : ১৫)

জহির রায়হান একজন আশাবাদী গল্পকার। পাক হানাদার বাহিনীর শত নির্যাতন-নিপীড়নের মধ্যেও তিনি আশাহত হননি। কেননা তিনি জানতেন, রাতের অন্ধকারেই সুপ্ত থাকে দিনের আলো। এজন্যই তিনি পাক হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও বিরাট আকাশের সম্ভাবনাকে দেখতে পেয়েছেন :

> সামনে তাকাই। বিরাট আকাশ। কয়েকটা লাউয়ের মাচা। কচি লাউ ঝুলছে। কয়েকটা ধানক্ষেত। দুটো তালগাছ। দূরে আর একটা গ্রাম। (জহির, ২০০৯ : ১৯)

জীবনবাদী শিল্পী বলেই জহির রায়হান জীবনের সম্ভাবনাকে এভাবেই মূর্ত করে তোলেন তাঁর গল্পে। জহির রায়হান তাঁর 'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের একটি বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কনে পারঙ্গমতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

২.৫

সমাজসচেতন শিল্পী বলেই জহির রায়হান সমাজের ওপর জেঁকে বসা নানাবিধ কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, পীরপ্রথা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান চেয়েছেন। প্রগতিশীল সমাজভাবনা তাঁর শিল্পিসত্তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সনাতন জীবনদৃষ্টির বিপরীতে মানুষের চিত্তলোকে তিনি সঞ্চার করতে চেয়েছেন আধুনিক, প্রাগ্রসর বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনা।

'বাঁধ' গল্পে দেখা যায় – উপর্যুপরি বন্যায় ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গ্রামের মানুষ অসহায়তায় নিপতিত। এসব সাধারণ মানুষের অসহায়তা ও ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে জনৈক মনোয়ার পীর কীভাবে প্রতারণা শুরু করেছেন তার বাস্তবধর্মী বয়ান তুলে ধরেছেন জহির রায়হান। গ্রামের সহজ সরল মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মনোয়ার হাজিরা তাদের স্বার্থ হাসিল করে নেয় খুব সহজেই। গল্পটিতে 'জহির রায়হান গ্রামের সমাজ জীবনের শেকড়ে গাঁথা তথাকথিত পীরদের ভণ্ডামির চিত্র উদঘাটন করেছেন।" (আজহার, ১৯৯৬ : ৩০০)। এ যেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) *লালসালু* (১৯৪৮) উপন্যাসের আরেক মজিদ। কিন্তু মতি মাস্টারের মতো শিক্ষিত লোকদের কাছে মনোয়ার হাজিদের ভণ্ডামির এই রহস্য অগোচর থাকে না। সেজন্য গ্রাম ও ফসল রক্ষার জন্য জমির মুন্সীর নেতৃত্বে কয়েকশ জোয়ান মানুষ যখন পীরের শরণাপন্ন হয়ে 'অসহায়ের মতো ঊর্ধ্বে হাত তুলে চিৎকার করছে' (জহির, ২০০৯ : ৩৩) – তখন মাত্র পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে 'কোদাল চালাচ্ছে মতি মাস্টারের দল। এ বাঁধ ভাঙতে দেবে না তারা। কিছুতেই না। তাদের সোনার ফসল ডুবতে দেবে না তারা। কখনই না। (জহির, ২০০৯ : ৩৩)

মতি মাস্টারের একান্ত প্রচেষ্টায় ফসল রক্ষা পেলেও পরদিন সকালে জমির মুন্সী প্রচার করে যে মনোয়ার হাজির বদৌলতেই তাদের ফসল রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে মনোয়ার হাজির ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়েছে পাঠকের কাছে।

'অপরাধ' গল্পেও জহির রায়হান সমাজের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা পীর প্রথার ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরেছেন। এ গল্পে পীর প্রথার ভয়ংকর চিত্র উপস্থাপনের পাশাপাশি তৎকালীন মুসলমান সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ ও পর্দাপ্রথার

নির্মম চিত্রও পরিবেশিত হয়েছে। অশীতিপর ভণ্ড পীরের সঙ্গে সালেহার যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। পর্দাপ্রথার নির্মম দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন :

> পীর সাহেবের বাড়ির কঠোর শাসন। ঘরের ঝি-বৌদের বাইরের লোক যাতে দেখতে না পায়, তার জন্য জানালায় মোটা পর্দা টাঙানো। তা একটু ফাঁক করে বাইরে একপলক তাকাতে যাবে তাও স্বামীর নিষেধ। (জহির, ২০০৯ : ৫৭)

পাঁচ সতীনের কটাক্ষ আর অশীতিপর স্বামীর নিস্পৃহতা সালেহার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। চার বছর ঘর সংসার করার পর একদিন সে পালিয়ে পিত্রালয়ে চলে আসে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি তার, পীরের আদেশে একশ এক কোড়া বেত্রাঘাত করা হয় তাকে। এতে সে রক্তবমি করে মারা যায়। পীরপ্রথার নির্মম বলির শিকার হতে হয় সালেহাকে।

গ্রামের অসহায় ধর্মভীরু মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মোড়ল, মহাজন ও মৌলবিরা কীভাবে আত্মস্বার্থ হাসিল করে 'ইচ্ছা অনিচ্ছা' গল্পটি তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

২.৬

নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের মুখোশের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা নৈঃসঙ্গ্য, অপ্রাপ্তিজনিত বেদনাবোধ, পলায়নপর মনোবৃত্তি, সুবিধাবাদী রাজনৈতিক আদর্শ এবং হতাশা-কবলিত অন্তর্বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচনে জহির রায়হানের ছোটগল্প বাংলাদেশের সাহিত্যধারায় সঞ্চার করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা। মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী চরিত্র চিত্রণের পাশাপাশি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, তাদের আজন্মলালিত স্বভাব পরিবর্তন করে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার কাহিনিও বিবৃত হয়েছে। নাগরিক মধ্যবিত্তের স্বপ্ন, সংগ্রাম আর হৃদয়রহস্য নিয়ে গড়ে উঠেছে জহির রায়হানের গল্পভুবন। জহির রায়হানের সমাজসচেতন মানসতা এবং বস্তুতান্ত্রিক জীবনার্থের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে তাঁর ছোটগল্পে। (বিশ্বজিৎ, ২০০৯ : ১৮০)

নাগরিক মধ্যবিত্তের বহুবর্ণিল জীবনচিত্র রূপায়ণে জহির রায়হান মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। 'সোনার হরিণ' গল্পে নগরজীবন পরিসরে স্বল্প আয়ের এক মধ্যবিত্ত কেরানির অপ্রাপ্তিজনিত বেদনার শিল্পভাষ্য নির্মাণ করেছেন জহির রায়হান। অর্থনৈতিক সংকটজনিত কারণে মধ্যবিত্ত জীবনে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে থাকে যোজন যোজন দূরত্ব। একটানা দশ বছর হাড়ভাঙা খাটুনির পরও একটা সুন্দর ড্রেসিং টেবিল, একখানা মজবুত খাট আর একটা আরাম-কেদারা কেনার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেনি এই কেরানি।

'সোনার হরিণ' গল্পের চেয়েও করুণ ও মর্মস্পর্শী হলো 'হারানো বলয়' গল্পটি, যেখানে সংসারের অভাব অনটনের কাছে পরাস্ত হয়েছে আলম-আরজুর ঘর বাঁধার

স্বপ্ন। 'ছোট পাথর-সেটের একজোড়া বালা' (জহির, ২০০৯ : ২৬) বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আলম-আরজুর মধ্যে ভালোবাসার যে বলয় তৈরি হয়েছিল কলেজ জীবনে – সময়ের ব্যবধানে আমরা তার পাণ্ডুর, বিবর্ণ রূপটি প্রত্যক্ষ করি। অর্থনৈতিক টানাপড়েন মধ্যবিত্ত জীবনের একটি বড়ো সংকট, যা আলম-আরজুর পরিবারের নিত্যসঙ্গী। এদের একজন এখন কোম্পানি অফিসের সামান্য কেরানি, আরেকজন দুবেলা খেতেও পায় না। তাই আলমের কাছে আরজুর অকপট স্বীকারোক্তি :

> কেন কাঁপছি জানো? দুটো দিন, একমুঠো ভাতও খেতে পাইনি আমি, শুধু আমি নই – আমার ছোট ছোট ভাইবোন, আমার বুড়ো মা কেউ খায়নি। সবাই উপোস। (জহির, ২০০৯ : ২৭)

আরজুর সংসারের এই অসহায় অবস্থার কথা জেনেও তাকে কোনো সাহায্য করতে পারে না আলম। কেননা বেতনের সামান্য টাকায় তার নিজের পরিবার চালাতেই হিমশিম খেতে হয় তাকে। এভাবে আলম-আরজুর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত জীবনের সংগ্রামী রূপটি তুলে ধরেছেন গল্পকার।

সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টা মধ্যবিত্তের অন্যতম চারিত্র্যলক্ষণ। 'ভাঙাচোরা' গল্পের টুনু ও তার স্বামীর কার্যকলাপ মধ্যবিত্তের পলায়নপর চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। চার ছেলে-মেয়ের সংসার চালাতে হিমশিম খাওয়া টুনুর স্বামী পোস্ট অফিসের কাজ শেষে গোপনে রিকশা চালায়, অন্যদিকে টুনু স্বামীর অগোচরে পার্শ্ববর্তী মেসে রান্নার কাজ নেয়। কিন্তু একজন আরেকজনকে জানতে দেয় না তাদের এই গোপন কাজের কথা। রিকশা চালানোর কথা টুনুকে না বলতে সালামের প্রতি টুনুর স্বামীর অনুরোধ মধ্যবিত্তের পলায়নপর মানসিকতারই পরিচায়ক :

> ও কথাটা বলবেন না টুনুকে। প্রেসটিজ জ্ঞান বড় টনটনে ওর! জানতে পারলে কেলেঙ্কারি কিছু-একটা ঘটিয়ে বসবে। দোহাই আপনার –। (জহির, ২০০৯ : ৫৬)

অপরদিকে টুনুও তার বাল্যবন্ধু সালামকে অনুরোধ করে মেসে রান্নার কথা স্বামীকে না বলতে।

মধ্যবিত্তের পলায়নপর, সুবিধাবাদী মানসিকতার পাশাপাশি আন্দোলন সংগ্রামে তাদের গৌরবময় অংশগ্রহণের চিত্রও অঙ্কন করেছেন জহির রায়হান। 'একুশের গল্প'র তপু, 'সূর্যগ্রহণ' গল্পের কবি তসলীম এবং 'মহামৃত্যু' গল্পের শহীদ – এরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। অথচ এরাই মাতৃভাষার টানে বেরিয়ে এসেছে রাজপথে, আত্মদান করেছে অকুণ্ঠচিত্তে। সময়ের প্রয়োজনে মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে তার খোলস বিদীর্ণ করে বিদ্রোহীও হয়ে উঠতে পারে এই গল্পগুলো তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সফল রূপকার জহির রায়হান সময় ও পট-পরিসরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে মধ্যবিত্তের সংকট ও সম্ভাবনার চিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর ছোটগল্পে।

ছোটগল্পের সীমিতপরিসর ভুবনে জহির রায়হান স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীলভাবে তাঁর গভীর জীবন ও সমাজদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণশীল শিল্পদৃষ্টির সহযোগ-সন্নিপাতে ছোটগল্পগুলো হয়ে উঠেছে অনন্যস্বাদী। সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির নানাবিধ জটিলতার চিত্র উপস্থাপনের পাশাপাশি সমাজে বিরাজিত অপ্রথা-কুপ্রথা, অযৌক্তিক সংস্কারবুদ্ধি, নাগরিক মধ্যবিত্তের নৈঃসঙ্গ্য, আত্মগ্লানি, পলায়নপর মনোবৃত্তি অপ্রাপ্তিজনিত বেদনার রূপায়ণে তাঁর ছোটগল্প অর্জন করেছে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা। বাংলাদেশের ছোটগল্পশিল্পে জহির রায়হান যথার্থই প্রাতিস্বিকতামণ্ডিত ব্যক্তিত্ব।

গ্রন্থপঞ্জি

আজহার ইসলাম (১৯৯৬)। *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আরজুমন্দ আরা বানু (২০১৮)। *শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের কথাসাহিত্য*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা

কামরুদ্দীন আহমদ (২০১৪)। *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

চঞ্চল কুমার বোস (২০০৯)। *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

জহির রায়হান (২০০৯)। *গল্প সমগ্র*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা

মাহমুদুল বাসার (২০১১)। *জীবনশিল্পী জহির রায়হান*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা